The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 3 No. 6 August 2010
Page 117-144 Published on June 2014 by the Registar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাঙালির ভাষাবিতর্ক ও আবুল মনসুর আহমদ

ড. মো: চেঙ্গীশ খান
সহযোগী অধ্যাপক (বাংলা), বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫
E-mail: chenggish@gmail.com, chenggishkhan@yahoo.com

Abstract

There was a time when it was a matter of great debate whether Urdu or Bangla was the mother tongue of the Bengali Muslim. In the field of Bengali Language and Literature another debate was whether 'Musalmani Bangla' or 'Dhakaia Bangla' should be established in replace of 'Kolkattia Bangla' or 'Hinduani Bangla'. At that time most of the Muslim leaders, aristocrats and the elit class Bengali muslims thought that Urdu was their mother tongue. Abul Mansur Ahmad was one of the oppositionists of that idea. That controversy was ended through our language movement of 1952. On the other side, after separation of Bengal in literature few literatures took initiative to establish coloqual form of Bangla language quitting Sanskrit with versatile use of Arabic and Farsi in replacement of the established and practised language form. Abul Mansur Ahmad was one of the initiators of that initiative. According to him the language of literature of Bangladesh was 'Kolkattia Bangla' but in lieu of that he wanted to establish 'Dhakaia Bangla', but it was not accepted and granted to the scholars or the educated. Thus the essay highlights the idealogical

position of Abul Mansur Ahmad about both the controversy of mother language or state language and the debate of the language of literature of Bangladesh or the standard coloqual form.

Key words: Bengali Muslim, Mother Language, Language Movement, Standard Coloqual Language Form, Kolkattaia Bangla, Dhakaia Bangla.

এক.

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা কী– তা নিয়ে একটা বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল। মূলত ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের মূল বীজটি নিহিত ছিল সেখানেই। বৃটিশ শাসনের একশ বছরের মধ্যে মুসলমানগণ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিকসহ শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল, তা থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যও বাদ যায়নি। উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে কিছু মুসলিম নেতার চেষ্টায় মুসলমানরা ঘুরে দাঁড়ায়। বিদ্বৎসমাজের প্রচেষ্টায় উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ছিল মূলত হিন্দু-সমাজের জাগরণ, আর সেখানে মুসলমানদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। বিনয় ঘোষ (২০০৬;২২) তথাকথিত এই বিদ্বৎসমাজকে প্রায় সম্পূর্ণ 'মুসলমান বর্জিত' এবং এটিকে বাংলার 'প্রথম ও প্রধান ট্রাজেডি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলার এই নতুন বিদ্বৎসমাজকে সাধারণভাবে 'বাঙালী বিদ্বৎসমাজ' না বলে, বিশেষ অর্থে 'বাঙালী হিন্দু বিদ্বৎসমাজ' বলে অভিহিত করেছেন। এই বাঙালি হিন্দু বিদ্বৎসমাজের চেষ্টায় বাংলা ভাষা যখন দীর্ঘ ছয়শ বছরের প্রচলিত ভাষাকে পরিত্যাগ করে আরবি-ফারসি শব্দবর্জিত সংস্কৃতঘেঁষা বাংলায় রূপান্তরিত হলো, তখন মুষ্টিমেয় বাঙালি-মুসলমান বাংলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা মনে করে উর্দুকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে দাবি করলো। যেখানে উনিশ শতকীয় রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ হিন্দু বিদ্বৎসমাজ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সৃষ্টি করলেন, সেখানে পূর্বকথিত মুসলমানদের একাংশ বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে দাবি করলেন। এমনকি এ সময় উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ এমন ধারণাও পোষণ করতেন যে– 'তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন।'[১] আমাদের সৌভাগ্য

তাঁদের হীনমন্যতাকে সৃজনশীল ও চিন্তাচেতনায় অগ্রগামী মুসলমান-সমাজ প্রশ্রয় দেননি। আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এই অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম।

দুই.

মূলত 'ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ' বছর বাঙালী মুসলমানের এক মানসিক অবসাদের যুগ– বিশেষ করে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো বটেই' (আনিসুজ্জামান, ২০০১;১৩০)। উনিশ শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের মধ্যে যখন জাগরণের সৃষ্টি হলো এবং শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্য পেতে শুরু করলো, তখন এই জাগরণের নেতারা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় তো দেনই-নি উপরন্তু বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করলেন। ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের (১৯৯১;২৮-২৯) ভাষায়–

> ভাষার বাধা একটি জাতিকে কিভাবে পঙ্গু রাখতে পারে তার উদাহরণ ত আমরাই– অর্থাৎ ভারতের হিন্দু-মুসলমান এবং বিশেষ করে পূর্ববাঙলার মুসলমানরাই। ...ভারতের হিন্দু-মুসলমানের এই সাধারণ পঙ্গুতার উপরেও বিশেষ করে পূর্ববাঙলার মুসলমানের আড়ষ্ঠতার আরও দুটি কারণ ঘটেছিল। প্রথমটি মাতৃভাষা বাঙলার প্রতি অবহেলা, আর দ্বিতীয়টি ধর্মীয় ভাষা সম্পর্কিত মনে করে বাঙলার পরিবর্তে উর্দু ভাষার প্রতি অহেতুক আকর্ষণ বা মোহ।

ঢাকার নবাব পরিবার, রংপুর পায়রাবন্দের সাবের পরিবার, টাঙ্গাইল-করটিয়ার পন্নী ও দেলদুয়ারের গযনবী পরিবার, ময়মনসিংহ-ধনবাড়ির চৌধুরী পরিবার, বগুড়ার চৌধুরী পরিবার, সায়েস্তাবাদের চৌধুরী পরিবার, মেদিনীপুরের সোহরাওয়ার্দী পরিবার এবং নব্যশিক্ষিত নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রহিম, আবদুল জব্বার খান, সৈয়দ শামসুল হোদা প্রমুখ অভিজাত বাঙালি মুসলমান– যাঁরা সে-সময়ে বাঙালি মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাই উর্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে মনে করতেন (ওয়াকিল, ১৯৮৩;৫০৪)। এঁদের অনেকে মাতৃসম্পর্কে কিংবা স্ত্রীসূত্রে অবাঙালি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। এ ছাড়া অনেকের পূর্বপুরুষ বাইরে থেকে বাংলায় এসেছিলেন বলে তাঁরা নিজেদের 'বাঙালি' হিসেবে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন। অথচ বিশ শতকের প্রারম্ভে দেখা যায়– বাংলাদেশে উর্দু ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭,৮০,০০০ এবং অন্যদিকে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২,২২,৪৫,০০০ (এম.এ., ২০০৫;১১৬)। ১৮৮২ সনে শিক্ষা বিষয়ে তদন্তের জন্য সরকার উইলিয়াম হান্টারকে সভাপতি করে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। আর বাঙালি মুসলিম জাগরণের প্রাণপুরুষ পূর্ববঙ্গের (ফরিদপুর) অধিবাসী নবাব আব্দুল

লতিফ সেই শিক্ষা কমিশনে গিয়ে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মুসলমানদের জন্য উর্দুকে প্রাদেশিক ভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম করার এবং গ্রামের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মুসলমানদের জন্য সংস্কৃতবর্জিত আরবি-ফারসি বহুল বাংলা ভাষাকে প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন (ওয়াকিল, ১৯৮৩;৫০৬)। এ ছাড়াও তিনি বলেন– 'উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা উর্দুতে কথা বলেন এবং যদি কোন মুসলমান উর্দু না জানে তাহা হইলে অভিজাত মুসলমান সমাজে তাহাকে গ্রহণ করা হয় না' (এম.এ, ২০০৫;১২৭)। শিক্ষা কমিশনের কাছে পরামর্শপত্রে তিনি লিখেছিলেন–

> Briefly summerised, my opinion as regards Bengal, is that primary instruction for the lower classes of the People, Who for the most part are ethnically allied to the Hindoos, should be in the Bengali Language-purified, however, from the superstructure of Sanskritism of learned Hindoos and supplemented by the numerous words of Arabic and Persian Origin which are current in everyday speech:
>
> For the middle and the upper classes of Mahomedans, the Urdoo should be recognised as the varnacular. ...The middle and upper classes of Mahomedans are descended from the original conquerors of Bengal, or the pious, ...All these, for the most part, naturally retain the Urdoo as their vernacular. (উদ্ধৃত: সফিউদ্দিন, ১৯৯৯;২৮)

এই অনাকাঙ্ক্ষিত মনোবৃত্তি অভিজাত শ্রেণিভুক্ত হওয়ার বাসনায় বেশ কিছু বাঙালি মুসলমানকে প্রলুব্ধ করেছিল। অবশ্য এ সময় মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রাণপুরুষরা মুসলমানদের সর্বভারতীয় রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এ কারণে সে-সময়ের বিভিন্ন মুসলিম সভা-সেমিনারের ভাষা ছিল উর্দু। ফলে হিন্দুরাও বাঙালি মুসলমানদের বাঙালি বলে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত ছিল। এরই প্রতিক্রিয়া একদল বাঙালি হিন্দুর মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। এ সময় চরমপন্থী হিন্দু পুনর্জাগরণবাদীদের 'সনাতন ধর্ম-রক্ষিণী সভা' (১৮৭৩) 'হিন্দু মেলা' (১৮৬৭) 'গো-হত্যা নিবারণী সভা' (১৮৮২) 'শিবাজী উৎসব' (১৮৯৫) 'হিন্দু মহাসভা' প্রভৃতির মাধ্যমে 'অহিন্দুরা ভারতীয় নয়' 'হিন্দুস্থান একমাত্র হিন্দুদেরই দেশ' ইত্যাদি বক্তব্যের প্রতিবাদে মুসলমানরা স্বতন্ত্র ধারায় চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছিল[২] (আনিসুজ্জামান, ২০০১:৭৫)। তাই যে-কারণে হিন্দু-বাংলা কান্যকুব্জ এবং

কাশীর দিকে মুখ ফিরানো ছিল– সে-কারণেই মুসলিম-বাংলা তার আরও পশ্চিমে– আরব আর পারস্যের দিকে চেয়ে ছিল (রশীদ, ১৯৮৭:৫৩)। তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল উদারনৈতিক শ্রেণির কাছে চরমপন্থী শ্রেণি টিকে থাকতে পারেনি। বাঙালি মুসলমানদের বড় একটি অংশ অচিরেই তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং তাঁরা বাংলাদেশকে নিজের মাতৃভূমি ও বাংলাকে নিজের মাতৃভাষা হিসেবে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে সাহিত্যচর্চায় নিমগ্ন হন। প্রথমত বাঙালি এবং অতঃপর মুসলমান হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা উর্দুর বিপক্ষে অবস্থান নেন। তবে উর্দুর পক্ষাবলম্বীদের অবস্থান স্তি-মিত হলেও তা কখনো নির্মূল হয়ে যায়নি। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করলেও পূর্ববাংলার আপামর ছাত্র-জনতার প্রতিরোধের মুখে প্রতিষ্ঠিত এই শ্রেণি পিছু হটতে বাধ্য হয়। এ প্রেক্ষাপটে আবুল মনসুর আহমদের অবস্থান স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে। তবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর চিন্তাচেতনা একটা ব্যতিক্রমী ধারায় অগ্রসর হয়েছে। ১৯৪৪ সনের ৫ মে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি সে-সময়ের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা, চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের সামনে প্রস্তাবিত পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আদর্শ তুলে ধরেন–

> প্রতীকবাদী সুন্দর-পূজারী আর্টবাদী হিন্দু-সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতি তেমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। হক-ইনসাফবাদী কল্যাণমুখী মুসলিম সংস্কৃতি তাই সমাজ-কেন্দ্রিক। ...বাঙলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনেসাঁ আনতে হলে তার সাহিত্য-সাধনাকে অনুকরণ-অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব সাহিত্য দিতে হবে।
>
> ...বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। এই দুই দিকেই আমরা পুঁথি সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।
>
> ...পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা সংস্কৃত ব্যাকরণের বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূর্ব পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষায় নিজস্ব সত্যকার বাংলা ব্যাকরণ রচনা করবে। (আবুল, ১৯৯৫;৯৬)

আবুল মনসুর আহমদ ভাব, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুঁথিসাহিত্যের জগতেই বিচরণ করতে চেয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য ও ভাষা হচ্ছে হিন্দুয়ানি সাহিত্য ও ভাষা এবং তার সমান্তরালে তিনি চালু করতে চেয়েছেন বাঙালি মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যকে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে হিন্দুয়ানি ভাষা-সাহিত্য মনে করে তা পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। সে-সময় মুসলমান সাহিত্যিকদের কেউ কেউ এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের সাহিত্যের ভাষাকে অনুসরণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা না করে তার পরিবর্তে 'মুসলমানী বাংলা' প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৯২৩) একটি বক্তব্যে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়–

> রবীন্দ্রপন্থীরা ভাষাকে যেমন কোমল করিতে যাইয়া কম জোর ও রুগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন, মোছলমানের তাহা অনুকরণযোগ্য নহে। ...আমরা যদি বাংলা ভাষাকে বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ ও বীর ভাষা করিতে চাই, তাহা হইলে তাহাকে আরবী তাজী ঘোড়ায় চড়াইয়া লাঙ্গা শমশের হাতে দিয়া জঙ্গের ময়দানে কুচকাওয়াজ পাঁয়তারা ভাজা শিখাইতে হইবে। (উদ্ধৃত: মুস্তাফা, ২০০১:২৬৬)

এই চেতনায় লালিত হয়েই আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন এবং তার আদর্শ রূপও দেখিয়েছেন।

তিন.

একই ভূখণ্ডের অধীন একই সমাজে ও একই মাতৃভাষার অধিকারী হয়ে দুটি ভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলন কীভাবে সম্ভব তার ব্যাখ্যা আবুল মনসুর আহমদ দেননি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আপামর বাঙালি, লেখকের এই ভেদনীতিকে সঙ্গত কারণেই গ্রহণ করেননি। তাই বর্তমান প্রজন্ম বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যেমন গর্ববোধ করে, তেমনি কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়েও সমানভাবে গর্ববোধ করে। ধর্মীয় কারণে হিন্দু কবি-সাহিত্যিকের লেখায় যেমন হিন্দুদের জীবনাচরণ বেশি থাকা স্বাভাবিক, তেমনি মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের লেখায় মুসলমানদের প্রসঙ্গও বেশি থাকা স্বাভাবিক। এটাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখাই সঙ্গত। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মুখের ভাষা তো বিভিন্ন অঞ্চলভেদে বিভিন্নরকম। একই অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষায় ধর্মভেদে কোনো পার্থক্য নেই বললেই চলে। মুখের ভাষার আদর্শ রূপ হিসেবে ভাগীরথী তীরের শান্তিপুর-নদীয়াবাসীর ভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে– যা বর্তমানে চলতিরীতির ভাষা হিসেবে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত, এই ভাষাকে লেখক বাঙালি মুসলমানের ভাষা হিসেবে গ্রহণ

করতে চাননি। এটাকে লেখক হিন্দুর ভাষা হিসেবে মনে করেছেন এবং সম্মিলিত সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার হিন্দু-আঙ্গিক ও মুসলমান-আঙ্গিকের সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানিয়েছেন।

> হিন্দু ভাইরা যদি বাংলা ভাষার বর্তমান হিন্দু আঙ্গিক ত্যাগ করে মুসলিম আঙ্গিক গ্রহণ করেন, তবে এক সাথে দুটো লাভ হবে। এক. বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের এক ভাষা ও এক সাহিত্য থাকবে। দুই. বাংলা ভাষা উর্দু ও হিন্দীর সাথে বাজী রেখে চলতে পারবে। হিন্দী ও উর্দু লম্বা দৌড়ে নিজেদের বিস্তারিত ও প্রসারিত করে সারা ভারত গিলতে চেষ্টা করছে। তার জন্য তারা নিজেদের আঙ্গিক ও ফরমকে সারা ভারতীয় করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছে। আমরা যদি উর্দু ও হিন্দী ভাষা থেকে বাংলা ভাষার সাহিত্যকে হেফাজত করতে চাই, তবে বাংলা ভাষার আঙ্গিককে সারা ভারতীয় করে তুলতে হবে। (উদ্ধৃতঃ লায়লা, ১৯৮৯:১৪৩-১৪৪)

আবুল মনসুর আহমদের এই অহেতুক আশঙ্কা পূর্ববাংলার বিদ্বৎসমাজের সচেতনতার ফলে কখনো শেকড় প্রোথিত করতে পারেনি। এটা হচ্ছে দেশবিভাগের পূর্বে (১৯৪৫ সনে) অখণ্ড বাংলার ভাষা-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান সমন্বিত সাহিত্যচর্চার স্বরূপ সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তাভাবনা। আর দেশবিভাগের পরে যখন প্রত্যাশিত অখণ্ড বাংলার পরিবর্তে খণ্ডিত বাংলার জন্ম হলো এবং তার সঙ্গে যুক্ত হলো বারো শ মাইল দূরের পশ্চিম-পাকিস্তান নামের অন্য একটি অংশ, যার সঙ্গে শুধু ধর্ম ছাড়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক ছিল না, তখন লেখক সেই সমন্বিত ভাষা-সাহিত্যচর্চার দাবি থেকে সরে এসে শুধু পূর্ব-বাংলার বাঙালি মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য সাধনার কথা বলেছেন। সে ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন যে, ভৌগোলিক সত্তা অনুযায়ী 'পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত' (আবুল, ১৯৯৫;৯৬)। বিশেষ করে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারাকে পশ্চিম-বঙ্গীয় ভাষা-সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত করে ও তা থেকে মুক্ত হয়ে পুর্ব-বাংলার ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ নিম্নরূপ—

> 'বাংলার মানুষের সমাজ একটা নয়, দুইটা। ...এই দুইটি সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই।

> বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ আশ্রয় স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে। পাক-বাংলার কালচার অর্থে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের কালচার বুঝাইতেছি।' (আবুল, ১৯৯৫;২১)

> 'পশ্চিম বাংলা যে আমাদের দেশ নয়, কলিকাতার কৃষ্টি সাহিত্য যে আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্য নয়, শান্তিনিকেতনী ভাষা যে আমাদের ভাষা নয়, এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ংগম করিতে জনগণের সময় লাগিতে পারে, কিন্তু চিন্তানায়কদের লাগিবে কেন? ...রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও বাংলার জাতীয় কবি নন। বাংলার জাতীয় কবি নন তিনি এই সহজ কারণে যে বাংলায় কোন 'জাতি' নাই। আছে শুধু হিন্দু-মুসলমান দুইটা সম্প্রদায়। ...এইখানে আছে দুইটা কৃষ্টি: একটা বাংগালী হিন্দু-কৃষ্টি অপরটি বাংগালী মুসলিম-কৃষ্টি। ...পশ্চিম বাংলার সাহিত্য উন্নত সাহিত্য হিসাবে নিশ্চয়ই আমাদের অনুকরণীয়; কিন্তু তা আমাদের নিজের সাহিত্য নয়।' (আবুল, ১৯৯৫;৩৯)

কিন্তু পূর্ব-বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যে তার প্রতিফলন না ঘটায় এবং পশ্চিম-বাংলার ভাষা-সাহিত্যকে নকল করায় লেখক তাঁদের সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে পূর্ব-বাংলার স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য সৃষ্টির মূল দায়িত্ব লেখক-সাহিত্যিকদের।

> আমরা কলিকাতার কৃষ্টি পশ্চিম বাংলার পরিবেশ ও শান্তি নিকেতনের রচনাভংগি নকল করিয়া সুখী ও বিদগ্ধ হইতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমাদের জাতীয় কবি আখ্যা দিয়া রবীন্দ্র-সংগীতের সাগরে ডুব পাড়িতেছিলাম। কাজেই আমাদের প্রকাশকরা পশ্চিম বাংলার পুস্তক রিপ্রিন্ট করিয়া, বিক্রেতারা তা বেঁচিয়া এবং পাঠকরা তা গোগ্রাসে গিলিয়া পাক-বাংলাকে পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টিক উপনিবেশ, ভাষিক সীমান্ত প্রদেশ ও সাহিত্যিক(?) বজায় করিয়া রাখিয়াছেন। আর আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া অসহায় দর্শকের মতই এই বেচা-কেনা দেখিতেছিলেন। (আবুল, ১৯৯৫;৩৮)

যে গোলামী মনোভাবের বিরুদ্ধে লেখক সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন সেটা হচ্ছে ভাষার গোলামী। লেখকের মতে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মুখের ভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মানুষের মুখের ভাষার একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা অখণ্ড বাংলার রাজধানী থাকায় এবং এই কলকাতাকে কেন্দ্র করে সব ধরনের ভাষিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্রীভুত হওয়ায় সাহিত্যের মানভাষা হিসেবে কলকাতার

বাংলাকেই গ্রহণ করা হয়েছিল। তখন মুসলমান কবি-সাহিত্যিকও এই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু দেশভাগের পর পূর্ববাংলার বা পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে মানভাষা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলার অনুসরণকে লেখক সমর্থন করেননি। কলকাতার ভাষার পরিবর্তে তিনি সেখানে প্রতিস্থাপন করতে চেয়েছেন পূর্ববাংলার আঞ্চলিক, বিশেষ করে ময়মনসিংহ-ঢাকার বাংলাকে। আর এর মধ্যে একদিকে প্রচুর পরিমাণে মুসলমানী শব্দ ঢোকাতে এবং অন্যদিকে প্রচলিত ক্রিয়াপদসহ অন্যান্য পদের রূপকে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পশ্চিমবাংলার সাধু-বাংলা ও কথ্য-বাংলার মধ্যে কিছু শব্দে পার্থক্য থাকলেও পূর্ব-বাংলায় সে পার্থক্য নাই। যেমন– "পশ্চিম বাংলার কথ্যভাষায় 'সুতা'কে 'সুতো' 'রূপা'কে 'রূপো' 'তুলা'কে 'তুলো' 'উল্টা'কে 'উল্টো' এমনকি মুসলমানী নামের আরবী 'উল্লা'কে 'উল্লো' করা হইয়াছে। এমন শব্দ বিকৃতি অনেক আছে। কিন্তু পূর্ববাংলায় এগুলি সাধু রূপেই কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে"(আবুল, ১৯৯৫;৬০)। তাই 'সুরা' 'যুবা' 'মুদ্রা' 'শুধা' 'মূর্ছা' ইত্যাদি অনেক শব্দ যেমন সাধুরূপেই উচ্চারিত হয়, তেমনি সুতা, রূপা, তুলা, উল্টা, ইচ্ছা, মিঠা, হিসাব, নিকাশ প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তন না করে অবিকৃতভাবেই ব্যবহার করার পক্ষে লেখক মত দিয়েছেন। অবশ্য বাংলাদেশের লেখকেরা তাঁর মতামতের তোয়াক্কা না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ-সব বানান ব্যবহার করেছেন। তেমনি ক্রিয়াপদের রূপের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পশ্চিম-বাংলা ও পূর্ব-বাংলার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে পূর্ব-বাংলার রূপকেই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। যেমন– 'বসাইয়া', 'করাইয়া', 'ধরাইয়া' ইত্যাদি শব্দের কথ্যরূপ পূর্ব-বাংলায় 'বসা'য়া', 'করা'য়া' ও 'ধরা'য়া'। আর এই শব্দগুলোর পশ্চিম-বঙ্গীয় কথ্যরূপ হলো 'বসিয়ে', 'করিয়ে, 'ধরিয়ে' (আবুল, ১৯৯৫;৮১)। একইভাবে পশ্চিম-বঙ্গীয় 'খেয়েছি', 'খাইতেছি', 'করি নাই' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের পরিবর্তে পূর্ব-বঙ্গীয় রূপ যথাক্রমে 'খাইছি', 'খাচ্ছি', 'করিনি' প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব্যবহারকে লেখক অধিক যৌক্তিক মনে করেছেন (আবুল, ১৯৯৫;১৩২)। এমনিভাবে লেখক ক্রিয়াপদের ও অন্যান্য পদের পশ্চিম-বঙ্গীয় ও পূর্ব-বঙ্গীয় রূপের ভিন্নতার উদাহরণ দিয়ে ভাষাকে সুন্দর, সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন (আবুল, ১৯৯৫;১৩৫-১৩৬)–

> ১. ভাষায় নতুন জটিলতা আমদানী না করা, যথা: 'করিতেছি' অর্থে 'করতেছি' না বলিয়া 'করছি' বা 'কচ্ছি' বলা, 'দেখিতেছি' অর্থে 'দেখতেছি' না বলিয়া 'দেখছি' বলা, 'বলিতেছি' অর্থে 'বলতেছি' না বলিয়া 'বলছি' বলা ইত্যাদি। এতে ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতা বাড়িতেছে। কারণ 'করছি' 'দেখছি' পূর্ব-

পাকিস্তানের অধিকাংশ জিলায় 'সম্পন্ন বর্তমান কালের ক্রিয়া' বুঝায় অর্থাৎ কাজগুলি হইয়া গিয়াছে। যদিও ঐ প্রকার ব্যবহারে পশ্চিমবাংলায় শব্দের প্রথম হরফে এবং পূর্ব-বাংলায় শেষ হরফে জোর বা এক্সন্ট্ দেওয়া হয়, তবু শুধু এ এক্সেন্টের পার্থক্য দিয়া পূর্ববাংলার জনগণকে অর্থের পার্থক্য বুঝানো যাইবে না। সে চেষ্টাও অনাবশ্যক। কারণ পূর্ব-বাংলার প্রচলিত 'করতেছি' 'দেখতেছি' শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলার লোকেরাও বলিতে ও বুঝিতে পারে।

২. বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণকে হুবহু ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা না করা, যথা: শুনাকে 'শোনা', ইচ্ছাকে 'ইচ্ছে', করবেনকে 'কোরবেন', করবকে 'কোরবো', হলকে 'হলো', দেইকে 'দি', নাইকে 'নি', করতেকে 'কত্তে', পারতেকে 'পাত্তে' ইত্যাদি ইত্যাদি। ... যেমন: ধরুন কোন কোন অঞ্চলের লোক লেখে 'প্রথম' 'প্রস্তাব' কিন্তু বলিবার সময় বলে 'পেরথম' 'পেরেস্তাব' ইত্যাদি। এইভাবে উচ্চারণের ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নিলে আমরা 'করব' লিখিয়াও 'করবো' বা 'কোরবো', 'করে' লিখিয়াও 'কোরে' বা 'কৈরা', 'হয়ে' লিখিয়াও 'হোয়ে' বা 'হৈয়া' উচ্চারণ করিতে পারিব এবং জটিলতা এড়াইয়াও আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ কথ্যভাষা সৃষ্টি করিতে পারিব।

৩. পশ্চিম-বাংলার অনুকরণে 'ইয়া' যুক্ত ক্রিয়াপদকে অতিরিক্ত মোচড়াইবার চেষ্টা না করা, যথা: সরাইয়া স্থলে 'সরায়ে'র বদলে 'সরিয়ে', পরাইয়ার স্থলে 'পরায়ে'র বদলে 'পরিয়ে', পড়াইয়ার স্থলে 'পড়ায়ে'র বদলে 'পড়িয়ে'... ইত্যাদি। এইসব বিকৃতিতে ক্রিয়াপদকে অনাবশ্যকভাবে মূল ধাতু হইতে এতদূরে সরাইয়া দেওয়া হয় যে, চিনিবার উপায় থাকে না। পক্ষান্তরে উক্ত 'সরায়ে', 'পড়ায়ে', 'বেড়ায়ে', 'খাওয়ায়ে', 'পরায়ে' বলিলে পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার কথ্যভাষার মধ্যে একটা সুন্দর আপোসরক্ষা হয়। ...পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার ভাষাভাষীদের নয়া মিশ্রণে পূর্ব-পাকিস্তানে যে নয়া জবান গড়িয়া উঠিবে, তাতে পূর্ব-ও পশ্চিম-বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের এই ভাষিক আপোস আমাদের ভাষার উন্নতি বিধান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

আসলে তিনি চেয়েছিলেন পূর্ব ও পশ্চিমবাংলার বাঙালির মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির একটি দেয়াল তৈরি করতে। এ ছাড়া পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষায় লেখক যথেষ্ট পরিমাণে মুসলমানী শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। পশ্চিমবঙ্গীয় লেখক-সাহিত্যিকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই এবং

অনেকটা ষড়যন্ত্র করেই বাংলা ভাষায় প্রচলিত মুসলমানী শব্দ পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে হিন্দুয়ানি শব্দ প্রয়োগ করেছেন বলে লেখক মনে করেন। 'কলম'কে 'লেখনী', 'তাজ'কে 'মুকুট', 'তলওয়ার'কে 'তরবারী', 'ঘোড়া-সওয়ার'কে 'অশ্বারোহী', 'শহর'কে 'নগর', 'আয়না'কে 'আরশী', 'গোশত'কে 'মাংস', 'লহু'কে 'রক্ত', 'পানি'কে 'জল', 'কাংকই'কে 'চিরুনী' ইত্যাদি করাকে লেখক পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্যিকদের 'মুসলিম বিদ্বেষী' ও 'পূর্ববঙ্গ বিদ্বেষী' মনোভাবের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবেই দেখেছেন। তাঁর এ অনুভবের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া ব্যাকরণের বিভক্তি ও মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদে সম্ভ্রমসূচক 'বা'-এর পরিবর্তে 'বে'-এর ব্যবহার (যেমন– পূর্ববঙ্গে 'তুমি যাইবা' 'তুমি খাইবা' ইত্যাদির পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গে 'তুমি যাইবে', 'তুমি খাইবে' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়) ও সংখ্যাবাচক শব্দের বিভিন্ন রূপে সংস্কৃত বা হিন্দি ভাষারীতির গ্রহণকে লেখক একই দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং তার পূর্ববঙ্গীয় রূপের ব্যবহারকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে– 'কলিকাতা-কেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার বিশালতার চাপেই পূর্ববাংলা ও মুসলিম বাংলাকে নিষ্পিষ্ট করিয়াছে' (আবুল, ১৯৯৫;৮০)। সে-কারণে বিভাগ-পরবর্তী পূর্ব-বাংলার ভাষাকে তিনি পশ্চিমবঙ্গীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। আর এভাবেই তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যে ও কথোপকথনে আদর্শ কথ্যভাষা অর্থাৎ 'ঢাকাইয়া বাংলা'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত 'কলকাতাইয়া বাংলা'র বিপরীতে পূর্ব-বাংলার আদর্শ কথ্যরূপ হবে এই 'ঢাকাইয়া বাংলা'।

> কথ্য ভাষা মানে কোনও জিলা বা অঞ্চলের অবিকল ডায়ালেক্ট নয়। যে সফিস্‌টিকেটেড বাংলায় আমাদের রাজধানী ও অন্যান্য শহর-নগরের সুধীসমাজ কথা বলেন, যে ভাষায় বক্তৃতা করিয়া আমাদের বিগত ও বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা যুগে যুগে বিভিন্ন আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন, যে ভাষায় আমাদের আলেম সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া ওয়াজ নসিহত খোতবা পাঠ ও ধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন, যে ভাষায় পল্লী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক-অধ্যাপক ও জমিদার তালুকদাররা শতাব্দী কাল ধরিয়া কথা বলিয়া আসিয়াছেন, সেইটাই পূর্ব-বাংলার স্টান্ডার্ডাইয্‌ড কথ্য বাংলা ভাষা। (আবুল, ১৯৯৫;৬৮)

আর 'কলকাতাইয়া বাংলা'র স্থানে 'পূর্ব-বাংলার স্টান্ডার্ডাইয্‌ড কথ্য বাংলা' অর্থাৎ ঢাকাইয়া বাংলাই হবে আমাদের গল্প-উপন্যাস ও স্টেজ-সিনেমার সংলাপের ভাষা। এই ভাষাকে সাহিত্যে প্রয়োগের জন্য লেখক দুটি নির্দেশনা দিয়েছেন। এক. 'প্রবন্ধে-নিবন্ধে

তাঁরা সর্বদাই সহজ সাধু বা লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন' এবং দুই. 'গল্পকার ও ঔপন্যাসিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে গল্পকারের ভাষা সাধু রাখিবেন। শুধু পাত্র-পাত্রীর ভাষা কথ্য করিবেন' (আবুল, ১৯৯৫;৬৯)। তবে 'ঢাকাইয়া বাংলা' বলতে লেখক ঢাকার আদিবাসী 'কুট্টি'দের ভাষাকে বোঝাননি। ঢাকা শহরের শিক্ষিতজনের স্ট্যান্ডার্ড ভাষার সঙ্গে সর্বজনস্বীকৃত শালীন ও শোভন ভাষার তেমন মৌলিক পার্থক্য নেই।

পূর্ব-বাংলার ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আবুল মনসুর আহমদের স্বকীয়তা রক্ষা বা স্বাতন্ত্র্যচিন্তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বর্তমানে বাংলাদেশের সাহিত্যে ও ভদ্রসমাজের মুখের ভাষায় কলকাতার বাংলাই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সাধুরীতির ব্যবহার উভয় বাংলাতেই ক্রমানুযায়ী সংকীর্ণ হয়ে গেছে। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৪;১১) এ বিষয়টি স্বীকার করে বলেছেন–

> বাংলার যে চারটি প্রধান উপভাষা– রাঢ়ী, বরেন্দ্রী, কামরূপ ও বঙ্গ– এর মধ্যে রাজনৈতিক কারণে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভাষা আজ অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন পরিবারের ভিতর এর ব্যবহার এখনও আছে বটে, কিন্তু ক্রমেই রাঢ়ভূমির ভাষা এদেশের একমাত্র ভাষা হয়ে উঠেছে। সাহিত্যকর্মে এই ভাষারই জয়জয়কার। এখানে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের শিষ্ট সমাজে, সাহিত্যকর্ম, সভাসমিতি, অভিনয়, ছায়াচিত্র, বেতার ও দূরদর্শনে কলকাতার ভাষাই ব্যবহৃত হয়।

আবুল মনসুর আহমদ এটি মেনে নিতে পারেননি। তাঁর (১৯৯৫;১৫৪) মতে– "১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় ভারতের 'আমিত্ব' 'ব্যক্তিত্ব' সুতরাং 'জাতিত্ব'ও ভারতেই বিদ্যমান ছিল। ...বাংলার 'আমিত্ব' পড়িয়াছে তৎকালীন পূর্ব-বাংলায়, আজিকার বাংলাদেশে। আজিকার বাংলাদেশই তাই সমগ্র বাংলা।" বিভাগপূর্ব বাংলার রাজধানী কলকাতা হওয়ায় এবং একে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও পত্র-পত্রিকার বিকাশ হওয়ায় কলকাতার ভাষাই সাহিত্যের ভাষা ও ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল; কিন্তু দেশভাগের পরে পূর্ব-বাংলার রাজধানী ঢাকা হওয়ায় একই কারণে এদেশের সাহিত্য ও ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা ঢাকাইয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক। আবুল মনসুর আহমদ তার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তবে অধিকাংশ চিন্তাবিদ এ মতের বিরুদ্ধতা করেছেন। ১৯৫৪ সনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ মতের বিরুদ্ধাচরণ করে বলেন– আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলা ভাষায় অপ্রচলিত আরবি ফারসি শব্দের আমদানী,

প্রচলিত বাংলা ভাষাকে গঙ্গাতীরের ভাষা বলে তার পরিবর্তে পদ্মাতীরের ভাষা প্রচলনের খেয়াল প্রভৃতি বাতুলতা আমাদের একদল সাহিত্যিককে পেয়ে বসল (উদ্ধৃতঃ বদরুদ্দিন, ১৯৭৩;১৯১)। অর্থাৎ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে আবুল মনসুর আহমদ এই দলেরই একজন সাহিত্যিক। মূলত বিভাগ-পূর্ব কালে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্রে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিলো তা কাটতে সময় লেগেছে। আত্মপরিচয়ের সীমানায় 'আমরা কি প্রথমত মুসলমান, অতঃপর বাঙালি'; নাকি 'প্রথমত বাঙালি, অতঃপর মুসলমান'– এসব বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভাগ-পরবর্তী পূর্ব-বাংলার বাঙালি মুসলমান চিন্তাবিদদের চিহ্নিত করা যায় (মুস্তাফা, ২০০১;১২)। এর মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ যেন নিজেকে শুধু একজন 'পূর্ব-বাংলার মুসলমান বাঙালি' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চার.

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তার স্বাতন্ত্র্যের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বাঙালি বর্ণহিন্দুদের অনেকেই যেমন সংস্কৃতকে নিজেদের ভাষা দাবি করে বাংলাকে নিম্নশ্রেণীর ভাষা হিসেবে মনে করতেন[৩], তেমনি বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা কি-না– এ নিয়ে তর্কবিতর্ক বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ থেকেই শুরু হয়েছিল। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের একটি অংশ বাংলাকে হিন্দুর ভাষা হিসেবে মনে করতেন। মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম (১৯৮৯;৪৭২) এঁদের উদ্দেশেই উচ্চারণ করেছিলেন সেই বিখ্যাত উক্তি– 'যে-সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী ।/ সে-সব কাহার জন্ম নির্নয় ন জানি ।/ দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুয়াএ ।/ নিজ দেশ ত্যাগি কেন বিদেশ না যায়'। উনিশ শতকের শেষার্ধে এসে বাঙালি মুসলমানদের অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি যখন নিজেদের মাতৃভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণ করতে চাইলেন তখনও এর বিরুদ্ধে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। অবশ্য 'সেকালে ঐ লোককেই শুদ্ধভাষী এবং খানদানী ভদ্রলোক বলা হতো যাঁর ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ থাকতো'[৪]।

> মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌরবের গোরস্তানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানের ভাষা 'বাংলা' কি 'উর্দু'– সে বিচার লইয়া মশগুল। কিছুদিন পরেই সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া, তাঁহারা বাঙলার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী-বাংলা'ও নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই 'উর্দু'। (মুহম্মদ, ১৯৬৮;৩০৩)

এই প্রচেষ্টাকে বিফল করতে বিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও সমকালীন মুসলিম সম্পাদিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে এঁদের মধ্যে আবার অনেকেই উর্দু বা আরবিকে মুসলমানদের জাতীয় ভাষা করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন। মওলানা আকরম খাঁ (১৯১৯) যেমন উর্দুর বিপক্ষে এক ভাষণে বলেছিলেন– "দুনিয়াতে অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। 'বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালা?' এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত"(উদ্ধৃত: মুস্তাফা, ২০০১;১৫৩; সফিউদ্দিন, ১৯৯৯:৪৬,৮০), তেমনি একই ভাষণে তিনি একথাও বলেছিলেন– 'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।' আবার একই ভাষণে তিনি বলেছিলেন– 'মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, একথা ভুলিলে মুছলমানের সর্ব্বনাশ হইবে।' অন্যদিকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৯১৯) বক্তব্য ছিল– 'আরবী এবং উর্দুকে বাদ দিয়া– বাঙলায় বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যাইবে না' (উদ্ধৃত: মুস্তাফা, ২০০১;২৫৮)। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে– 'বর্তমানে ভারতে সাধারণ ভাষা হইবার জন্য ইংরেজি ভাষা যেমন লায়েক, তেমনটি আর একটিও দেখি না' (উদ্ধৃত: মুস্তাফা, ২০০১;২৫৯)। ১৮৯০ সনে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৯০) বলেছিলেন– 'বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা 'বাঙ্গালা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে' (উদ্ধৃত: নূরুর-১, ১৯৯০:২৩১-২৩২)। ১৯০০ সনে *প্রচারক* (২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) সম্পাদক লিখেছিলেন–

> যতদিন আরবী এবং ফারসী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান বঙ্গভাষায় লেখা না হইবে, ততদিন চিন্তায় কোন ফল হইবে না। যেদিন মাদ্রাসার শিক্ষকেরা আরবী এবং ফারসী ভাষা বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় অর্থ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন, সেই দিন বঙ্গীয় মোসলমানের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইবে। (মুস্তাফা, ২০০১;২১)

১৯২৯ সনে নূরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী লিখেছেলেন– ' 'বাঙ্গালী' শব্দের ওপর আমাদের প্রতিবাসী হিন্দুর যে পরিমাণ অধিকার, তার চেয়ে আমাদের দাবী অনেকাংশে বেশী। ...ভারতের অর্দ্ধেক সংখ্যক মোসলমান আমরা এই বাঙ্গালা মায়েরই সন্তান' (উদ্ধৃত: মুস্তাফা, ২০০১;১৩৬)। এমনিভাবে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা সম্পর্কে বাংলা-উর্দু-আরবি-ইংরেজি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক থাকলেও কল্পিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে কেউ কোনো কথা বলেননি। বৃটিশবিরোধী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণে এ ভাষা-বিতর্ক কিছুটা স্তি

মিত হলেও লাহোর প্রস্তাবের পর চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন কল্পিত স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তোলেন আবুল মনসুর আহমদ। তিনি বরাবরই উর্দুর বিরুদ্ধে ও বাংলার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নিয়ে তিনি দেশবিভাগের চার বছর আগেই 'পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জবান' নামে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। এ যাবৎ প্রাপ্ত তথ্য থেকে বলা যায়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এটি ছিল প্রথম দাবি। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন–

> বাঙলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাঙলা হবে– কি উর্দ্দু হবে, এ তর্ক খুব জোরে-সোরেই একবার উঠেছিল। মুসলিম বাঙলার শক্তিশালী নেতাদের বেশির ভাগ উর্দুর দিকে জোর দিয়েছিলেন। নবাব আবদুর রহমান মরহুম, স্যার আবদুর রহিম, মৌঃ ফজলুল হক, ডাঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, মৌঃ আবুল কাসেম মরহুম প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা উর্দ্দুকে বাঙালি মুসলমানের "মাতৃভাষা" করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।
>
> ...অথচ **উর্দ্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করি,** তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করবো। জাতির যে অর্থ, শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দ্দু প্রবর্তনে অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্য নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব-পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের, এমনকি গোটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।[৫]

এটি আবুল মনসুর আহমদের স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালবাসার দৃষ্টান্ত। ১৯৪৩ সনে লেখা এই প্রবন্ধে পূর্ব-পাকিস্তান বলতে তিনি লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) একাধিক স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের যে ধারণা ছিলো, তার মধ্যে একটি অর্থাৎ পূর্ব-বাংলা, পশ্চিম-বাংলা ও আসাম রাজ্য নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রকে বুঝিয়েছিলেন। তখন মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলমানরা ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তান, পূর্বাঞ্চল নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান ও অবশিষ্ট হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ

অঞ্চল নিয়ে ভারত-রাষ্ট্র গঠনের জন্য এক চূড়ান্ত আন্দোলন চলছিল। আবুল মনসুর আহমদ অত্যন্ত দূরদর্শী চিন্তা নিয়ে কল্পিত পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা ও তার সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মত তুলে ধরেছিলেন। পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই তিনি অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। এ-কারণেই বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়টি তাঁর মনেই প্রথম আসে।

পাঁচ.

আবুল মনসুর আহমদের ভাষাচিন্তার মূল ভিত্তি ছিল পূর্ববাংলার মানুষের ভাষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। দেশবিভাগের পূর্বে তিনিই প্রথম কল্পিত স্বাধীন পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি আলোচনায় আনেন। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির মূল তাত্ত্বিক হিসেবে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের পাশাপাশি ভাষিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক আদর্শও তুলে ধরেন। ১৯৪৬ সনের নির্বাচনের পরে যখন দেশবিভাগ সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায়, তখন থেকে অনেকেই ভাবী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু সে চিন্তার সুনির্দিষ্ট কোনো ধারা ছিল না। ১৯৪৭ সনের ৩ জুন লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারত-বিভাগের চূড়ান্ত ঘোষণা দিলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করেন আবুল মনসুর আহমদ তাঁর সম্পাদিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায়। মূলত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করার পূর্বেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ*, *সওগাত*, *সাপ্তাহিক বেগম*, *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিল। এ-সময় আবদুল হক (তিনি তখন মোহাম্মদ আবদুল হক নামে লিখতেন) বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ও তার যুক্তি দেখিয়ে চারটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি 'বাংলাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যা দুই কিস্তিতে ১৯৪৭ সনের ২২ জুন ও ২৯ জুন তারিখে *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে ছাপা হয়। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে দ্বিতীয় প্রবন্ধ ৩০ জুন তারিখে *দৈনিক আজাদের* সম্পাদকীয়তে, 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' নামক তৃতীয় প্রবন্ধ ২৭ জুলাই তারিখে *দৈনিক ইত্তেহাদে* ও 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' নামে চতুর্থ প্রবন্ধ ৩ আগস্ট তারিখে *সাপ্তাহিক বেগম* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এসব প্রবন্ধে তিনি বাংলাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পাশাপাশি বাঙালির ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য এবং সে-অর্থে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন (আবদুল, ১৯৭৬;৮-১০)। ১৯৪৭ সনের জুন মাস থেকে কলকাতাকেন্দ্রিক যে-সমস্ত পত্র-পত্রিকা বাংলা ভাষার পক্ষে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছিল, তার মধ্যে *দৈনিক ইত্তেহাদের* ভূমিকা ছিল সবচেয়ে

বেশি। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম-সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলেও আবুল মনসুর আহমদ কলকাতায় থেকে যান। সেখান থেকেই তিনি *দৈনিক ইত্তেহাদের* মাধ্যমে ভাষা-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে *ইত্তেহাদের* প্রবেশকে নিষিদ্ধ করে। ফলে ঢাকায় স্থানান্তরের সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও সরকারের অসহযোগিতার কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। (আবুল, ১৯৮৮:৩৮১)।

১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জিয়াউদ্দীন আহমদ হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশের অনুকরণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার পক্ষে মত প্রকাশ করলে তার প্রতিবাদে বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পাকিস্ত-ানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা *দৈনিক আজাদে* ১২ শ্রাবণ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (২৯ জুলাই, ১৯৪৭) প্রকাশিত হয় (বদরুদ্দীন, ১৯৭৩;৩-৪)। এ ছাড়া কবি ফররুখ আহমদের 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' (*সওগাত*, আশ্বিন, ১৩৫৪), কাজী আবুল হোসেনের 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (*দৈনিক আজাদ*, ২২ জুন, ১৯৪৭), ড. কাজী মোতাহার হোসেনের 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা' (*সওগাত*, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪), ড. মুহম্মদ এনামুল হকের 'পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' (নভেম্বর, ১৯৪৭; কার্তিক, ১৩৫৪, নারায়ণগঞ্জ হতে *কৃষ্টি* নামক পত্রিকায় প্রকাশিত)[৬] প্রভৃতি প্রবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছিল ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'তমদ্দুন মজলিস' নামের একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৪৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫সেপ্টেম্বর এই সংগঠন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা– না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে (প্রিন্সিপাল, ১৯৭১;৭০)। পুস্তিকায় তমদ্দুন মজলিসের প্রধান কর্মকর্তা আবুল কাশেম পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম, আদালতের ভাষা ও অফিসাদির ভাষাকে শুধু বাংলা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ও উর্দু করার দাবি জানানোর সাথে-সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কারেরও প্রস্তাব করেন। এই পুস্তিকায় দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোতাহের হোসেনের 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা-সমস্যা' নামক প্রবন্ধ এবং অন্যটি ছিল কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদের* সম্পাদক আবুল

মনুসর আহমদের 'বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। দুই পৃষ্ঠার এই ছোট লেখাটির মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ বলেন– "উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারি চাকুরির 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল" (উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন, ১৯৭৩;১৮)। অবশ্য সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯৭০:৮৩) ১৯৪৭ সনে ৩০ নভেম্বরের এক বক্তৃতায় ও ১৯৪৮ সনের এক নিবন্ধে আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন–

> পূর্ব-পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে– ...এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (নূরুর-২, ১৯৯০:৩২২)

তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে প্রকাশিত ভাষা-আন্দোলনের প্রথম প্রচার-পুস্তিকার প্রতি শিক্ষিত জনসাধারণ এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তেমন উৎসাহ প্রদান করেননি, বরং "প্রায় সকলেই এই নতুন রাষ্ট্রে দুইটি রাষ্ট্রভাষা হওয়ার কথাকে 'রাষ্ট্রবিরোধী', 'অকল্যাণকর' বা 'অবাস্তব' আখ্যা দিতে থাকেন" (নুরুল, ১৯৭১;৫৯)। তা সত্ত্বেও তমদ্দুন মজলিসের কর্মীরা গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারি চাকুরে ও সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে সরকারের কাছে একটি মেমোরেন্ডাম পেশ করেন এবং তার কয়েকটি কপি পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হলেও পত্রিকাগুলো এতে বেশি গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু কলকাতা থেকে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে এর প্রতি আগাগোড়া সমর্থন দিয়েছিলেন (নুরুল, ১৯৭১;৬০)। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত ১৯৪৮ সনের ১১ মার্চ প্রতিবাদ দিবসে ও সাধারণ ধর্মঘটের দিনে একটি বিরাট মিছিলের সেক্রেটারিয়েট ভবন ঘেরাও ও তৎপ্রেক্ষিতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন পরিষদের সাথে আলোচনার আহ্বান জানান। সংগ্রাম পরিষদ যে ৭ দফা প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছিল তার মধ্যে কয়েকটি দফা প্রধানমন্ত্রী প্রথমে মানতে রাজী হচ্ছিলেন না। এর মধ্যে চার নম্বর দফাতে ভাষা-আন্দোলনকে সমর্থন করায় *দৈনিক ইত্তেহাদের* ওপর সরকার যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল তা প্রত্যাহারের দাবি ছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী প্রথমে তা মানতে অস্বীকার করলেও পরে তা মেনে নেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফার একটা চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেন (প্রিন্সিপাল, ১৯৭১;৮১)। এই চুক্তির ফলে সংগ্রাম পরিষদকে অভিনন্দন

জানিয়ে *ইত্তেহাদ* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ সময় বাংলাদেশে *ইত্তেহাদের* জনপ্রিয়তা এমন ছিল যে তা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও লোকমারফৎ বড় বড় প্যাকেটে নিয়মিতভাবে এটি ঢাকায় আসতো এবং ছাত্রনেতারা মাঝে মাঝে তা বিতরণ করতেন। এই ছাত্রদের মধ্যে তাজউদ্দিন আহমদ, শওকত আলী, শেখ মুজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন, অলি আহাদ প্রমুখ ছিলেন (তাজউদ্দিনের ডায়েরি, ২০.১২.১৯৪৭; উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন, ১৯৭৩;৪৪)।

ছয়.

ভাষা আন্দোলনের এ সময়ের প্রেক্ষাপট নিয়ে আবুল মনসুর আহমদ তাঁর পত্রিকায় অসংখ্য সম্পাদকীয় লেখেন। এর মধ্যে দুটি সম্পাদকীয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মানি অর্ডার ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় শুধু ইংরেজি ও উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ ছাড়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষার বিষয়-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেয়া ও নৌবাহিনীতে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে উর্দু ও ইংরেজিতে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সংগ্রাম পরিষদ শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের সঙ্গে দেখা করলে তাঁদের সঙ্গে তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয় এবং শিক্ষামন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে বাদ দেয়ার বিষয়টি নিতান্ত ভুলবশত বলে উল্লেখ করেন এবং তা সংশোধনেরও আশ্বাস দেন (নওবেলাল, ১৯.০২.১৯৪৮; উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন, ১৯৭৩;৪৩))। এর প্রতিক্রিয়ায় আবুল মনসুর আহমদ 'ভুলের পুনরাবৃত্তি' নামে এক সম্পাদকীয়তে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেন– 'গায়ের জোরে বা চালাকি করিয়া পাঁচ কোটি লোকের ঘাড়ে একটি ভাষা চাপান যাইবে না', 'এই পুনরাবৃত্তি 'ভুলই' হউক আর মতলবই হউক এর পরিণতি রাষ্ট্রের পক্ষে সমান বিষময়' (বদরুদ্দীন, ১৯৭৩;৪৪)। আবুল মনসুর আহমদের অপর গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়টি ছিল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বক্তব্যের জবাব। ১৯৪৮ সনের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবের উত্তরে লিয়াকত আলী খান বলেছিলেন–

> প্রথমে এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নির্দোষ বলিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমানে মনে হয় পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার ঐক্যসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন

> করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.০২.১৯৪৮; অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৭.০২.১৯৪৮; উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন, ১৯৭৩:৫৩)।

আবুল মনসুর আহমদ তাঁর পত্রিকায় 'অবিশ্বাস্য' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। তিনি বলেন–

> এমন একটি নির্দোষ প্রস্তাব এবং সে প্রস্তাবের সহিত পাকিস্তানের তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত তাহাকে বিভেদ সৃষ্টিকারী প্রস্তাব অভিহিত করাতে এ প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করার পথ খোলাসা হইয়াছে বটে কিন্তু ন্যায় ও যুক্তির দরওয়াজা বন্ধ করা হইয়াছে" (দৈনিক ইত্তেহাদ, ২৭.০২.১৯৪৮ উদ্ধৃত: বদরুদ্দীন, ১৯৭৩:৫৪)।

উল্লেখ্য যে, গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংশোধনী প্রস্তাবকে পূর্ব-বাংলার কোনো মুসলমান সদস্য সমর্থন করেননি, বরং অনেকে সে প্রস্তাবের নিন্দা ও বিরোধিতা করে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন (বদরুদ্দীন, ১৯৭৩;৫৩)। এ প্রেক্ষাপটে আবুল মনসুর আহমদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সরকারের বিতর্কিত ভাষানীতির বিরুদ্ধে এবং ভাষা আন্দোলনকারীদের পক্ষে। দেশবিভাগের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। ৫২-তে তা রুদ্ররূপ ধারণ করে। ১৯৫০ সনের গোড়ার দিকে *ইত্তেহাদের* অপমৃত্যু ঘটলে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৫০ সনের এপ্রিল মাসে কলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসেন এবং নিজ জেলা ময়মনসিংহে অবস্থান করেন (আবুল, ২০০১:১৮৭)। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলের নেতৃত্ব দেন।

সাত.

ভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলেও ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে স্থায়ী রূপ দেয়ার উদ্দেশ্যে আবুল মনসুর আহমদ ১৯৫৪ সনের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ২১ দফা মেনিফেস্টোর রচয়িতা হিসেবে তার ১নং দফায় বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা, ১৭ নং দফায় ভাষাশহীদদের জন্য একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা ও ১৮ নং দফায় ২২ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করেন (আবদুর ও শাহ, ১৯৮৭:১২৭)। কিন্তু ভাষা-আন্দোলনের সমান্তরালে বাংলা ভাষার সংস্কার, বর্ণমালা পরিবর্তন বা সংক্ষিপ্তকরণ, আরবি বা রোমান লিপির প্রবর্তন, ইত্যাদি

বিষয়ে যে জল্পনা-কল্পনা ও তর্ক-বিতর্ক চলছিল তাতে তাঁর তেমন কোনো ভূমিকা না থাকলেও তিনি যে বাংলা ভাষা সংস্কারের পক্ষে ছিলেন তা জানা যায়। ১৯৪৪ সনে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির সম্মিলনে মূল সভাপতির অভিভাষণে তিনি (১৯৯৫;১০৪) বলেছিলেন–

> বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবো না। এখন বাংলায় ৪৮টা হরফ আছে। এর উপর আছে কার ফলা ও যুক্তাক্ষর। এটা শুধু শিক্ষা সাহিত্যের উপর জুলুম নয়; ছাপা টাইপ ও টেলিগ্রাফ বেতার প্রভৃতি সকল রকম জ্ঞান-বিকাশের দিক থেকেও এই বর্ণ-বাহুল্য মারাত্মক রকম প্রগতি-বিরোধী। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম বড় কাজ এই বর্ণমালা কমানো। রেনেসাঁ সোসাইটির তরফ থেকে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে মাত্র কুড়িটি হরফ ও চারিটি হরকত বা কার থাকবে। ফলা ও যুক্তাক্ষর কিছু থাকবে না।

বাংলা ভাষার সংস্কারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন আবুল হাসনাৎ তাঁর *বাংলা ভাষার সংস্কার* (১৯৪৪) নামক গ্রন্থে। পাকিস্তান সরকার বাংলা বর্ণমালাকে আরবি বা রোমান হরফে রূপান্তরের যে অপচেষ্টা করেছিল, তা প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও বাংলা বানান ও বর্ণমালাকে সহজ ও সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁদের মত ব্যক্ত করেছিলেন। এর মধ্যে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'স্বরযোগ ও বানান' (*সওগাত*, চৈত্র, ১৩৫১) ও 'বাংলা ভাষার সংস্কার' (*সওগাত*, মাঘ, ১৩৫১); ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর 'সোজা বাংলা' (*সৈনিক*, ২৭ ফাল্গুন, ১৩৫৫), 'বাংলা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার' (*বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৭) ও 'বাংলা লিপি ও বানান সংস্কার' (বাংলা একাডেমীতে ২৯.০৯.১৯৬২ তারিখে পঠিত, শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ১৯৬৭); ড. কাজী মোতাহার হোসেনের 'বাংলা ভাষার সংস্কার' (*মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৫৭) প্রভৃতি প্রবন্ধ ছাড়াও মুহম্মদ ফেরদৌস খান, মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ পণ্ডিত বাংলা বানান ও বর্ণমালা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব পেশ করেছিলেন (আবুল, ২০০৯:১২২)। ড. আহমদ শরীফ ১৯৯২ সনে লিখিত 'বাঙলা ভাষার সংস্কার' নামক প্রবন্ধে বাংলা বর্ণমালা, বানানরীতি ও ব্যাকরণ সংস্কারের একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন (আবুল, ১৯৯২;৪০)। সেদিক থেকে আবুল মনসুর আহমদ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো প্রবন্ধ বা সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন না করলেও তিনি সংস্কারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। অবশ্য ভাষা সৈনিক আবুল কাশেম ১৯৪৭ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর

'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা– না উর্দু' নামে যে প্রচার-পুস্তিকা বের করেছিলেন তাতে তিনি 'ইতিমধ্যে প্রয়োজনানুযায়ী বাংলা ভাষার সংস্কার করতে হবে' বলে দাবি জানিয়েছিলেন (বদরুদ্দীন, ১৯৭৩:১৫)।

আট.

সরকারিভাবে ১৯৪৯ সনের ৯ মার্চ মওলানা আকরম খাঁকে সভাপতি করে 'পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটি' গঠিত হয় এবং ১৯৫১ সনের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা একটি রিপোর্টও পেশ করেন। এ ছাড়া ১৯৫৮ সনের ৩০ ডিসেম্বর আইউব খান জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন (সাঈদ-উর, ১৯৭৪;১৮৫)। অন্যদিকে ১৯৫৯ সনের ১৫ জুন তারিখে বাংলা একাডেমী পূর্ববঙ্গ ভাষা কমিটির সুপারিশ সংশোধিত আকারে গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও ১৯৬৭ সনের ২৮ মার্চ বাংলা লিপি, বানান ও ব্যাকরণের সংস্কার ও সরলায়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে (আবুল, ২০০৯;৫৪)। এসব কমিটি বিভিন্ন সুপারিশ পেশ করলেও বিরোধিতার মুখে তা বাস্ত-বায়িত হতে পারেনি। আবুল মনসুর আহমদ এসবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট না থাকলেও বিবৃতির মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিভিন্ন সংস্কারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন (দৈনিক পাকিস্তান, ১৮.০৯.১৯৬৮; উদ্ধৃত: আবুল, ২০০৯;৫৫)। এসবের ধারাবাহিকতায় সরকারিভাবে যখন বেতার-টেলিভিশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হয়, তখন তার পক্ষে-বিপক্ষে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের অবস্থান ছিল সরকারি নীতির পক্ষে।[৭] এখানেই আবুল মনসুর আহমদের সীমাবদ্ধতা। তাঁর ভাষার স্টাইল সম্পর্কে অবস্থান যেমন বাংলাদেশের সুধীজনের সমর্থন পায়নি, তেমনি রবীন্দ্রবিরোধিতা তথা সর্বজনীন বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তামসিক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রত্যাশিত মর্যাদা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। তারপরেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ, নির্ভিক ও সক্রিয় ভূমিকার জন্য আবুল মনসুর আহমদকে প্রতিটি বাঙালি অবশ্যই সশ্রদ্ধায় স্মরণ করবে।

টীকা

১. অক্ষয়কুমার সরকার, *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা, পৌষ, ১২৮০; মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ' কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেছিলেন। (উদ্ধৃত: সফিউদ্দিন, ১৯৯৯:চৌদ্দ) ও (উদ্ধৃত: ওয়াকিল, ১৯৮৩:৫০২)

২. ১৯৩৬ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ড. কুর্তপুতি বলেছিলেন— "Hindustan is primarily for the Hindus, who live for the Preservation and development of Aryan culture and Hindu Dharma. In Hidusthan the national race, religion and language ought to be that of the Hindus."(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০) হিন্দু মহাসভার নেতা ভাই প্রেমানন্দ বলেন– "হিন্দুস্থান একমাত্র হিন্দুদেরই দেশ এবং মুসলমান খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতির লোক যাঁরা এখানে বাস করছেন তাঁরা আমাদের অতিথি। তাঁরা যতদিন অতিথি হিসাবে থাকতে চান ততদিনই এখানে থাকতে পারেন।" (উদ্ধৃত; মোহাম্মদ, ১৯৮০:৬৫)

৩. এ-সময় "হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রাচারের দোহাই পেড়ে সংস্কৃত চর্চাকেই সমর্থন করত। তাছাড়া শাস্ত্রকথা বাংলায় অনুবাদ করাকে পাপকর্ম মনে করত। দেশী ভাষা চর্চার ফলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটবে– এ আশঙ্কায় তারা দেশী ভাষা চর্চার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ফলে যে-ই তাদের বাধা-নিষেধ আগ্রাহ্য করেছে তাকেই তারা 'সর্বনেশে' বলে গাল দিয়েছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস বাংলায় রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ করে 'সর্বনেশে' বলে নিন্দিত হয়েছিলেন।" (উদ্ধৃত: মোহাম্মদ, ১৯৮০:২৫)

সে-সময়ে প্রচলিত অবজ্ঞাসূচক একটি বাংলা ছড়ায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়– "কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুন-ঘেঁষে

— এ তিন সর্বনেসে।" (উদ্ধৃত: আহমদ, ১৯৭৮:১৮৭)

৪. ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর *A Grammer of the Bengali Language* ব্যাকরণের ভূমিকায় বলেছিলেন– "At present those persons are thought to speak the compound idiom (Bengali) with the most elegance who mix up with the pure Indian verbs, the greatest number of Persian and Arabic nouns." Vide, Dr. Dinesh Chandra Sen's The Bangali prose style, P. 6; (উদ্ধৃত: আবু, ১৯৭৯:৩)

৫. আবুল মনসুর আহমদ, 'পূর্ব্ব পাকিস্তানের জবান', *মাসিক মোহম্মদী*, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫০ (১৯৪৩); পত্রিকাটি বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে পত্রিকাটি সংরক্ষিত আছে।

৬. এই প্রবন্ধে তিনি বলেন– "উর্দুকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইলে, বাংলা-ভাষার সমাধি রচনা করিতে হইবে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরও জাতি হিসাবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করিতে হইবে। ...বস্তুতঃ, জাতিকে গলা টিপিয়া মারিতে হইলেই, তাহার উপর বিদেশীয় ভাষার ন্যায় একটি অভিশাপকে চাপাইয়া দিতে হয়।" (উদ্ধৃত: মুহম্মদ, ১৯৯৪:৫৬৭)

৭. ১৯৬৭ সনের জুন মাসে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রচার বন্ধ ঘোষণা করলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৯ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, জয়নুল আবেদীন প্রমুখ। অন্যদিকে এঁদের বিবৃতির বিপক্ষে ও সরকারি সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে কিছু বুদ্ধিজীবী পত্রিকায় বিবৃতি দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আহসান হাবীব, ইব্রাহীম খাঁ, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন প্রমুখ। অন্যদিকে বাংলা বানান ও লিপির সংস্কার বা সরলায়ন বিষয়ে পৃথকভাবে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গঠিত কমিটির সংস্কার প্রস্তাবের বিপক্ষে ৪১ জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি প্রদান করলে তাঁদের বিপরীতে ৫৮ জন বুদ্ধিজীবী বিবৃতি প্রদান করেন। আর আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এই সংস্কারের পক্ষে। (গোলাম, ১৯৮৮:২৫৩) ও (আবুল, ২০০৯:৫৫)

গ্রন্থপঞ্জি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৪, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী।

বদরুদ্দীন উমর, ১৯৭৩, *পূর্ব-বাংলার ভাষা-আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড। কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন।

আনিসুজ্জামান, ২০০১, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (১৭৫৭-১৯১৮)। ঢাকা : প্যাপিরাস।

আবুল কাশেম, ২০০৯, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য চেতনা*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আবুল কাসেম ফজলুল হক, ১৯৯২। *লোকায়ত* পত্রিকা, ১১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৯২, ঢাকা।

আবুল মনসুর আহমদ, ১৯৮৮, *আত্মকথা*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

আবুল মনসুর আহমদ, ১৯৯৫, *বাংলাদেশের কালচার*। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস। আটটি প্রবন্ধ নিয়ে *পাক-বাংলার কালচার* নামে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সনে। এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত মোট দশটি প্রবন্ধ হলো– ১. 'বাংলাদেশের কালচার' (২৪ মাঘ, ১৩৭২), ২. 'সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আঙ্গিক' (২৪ মাঘ, ১৩৬৯), ৩. 'ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা' (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪), ৪. 'পাক বাংলার রেনেসাঁ' (১৯৪৪ সনের পাঁচই মে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মূল সভাপতির ভাষণ), ৫. 'শিক্ষার মিডিয়াম' (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬), ৬. 'আনন্দের যোয়ার ঈদুল-ফিতর' (১ শাওয়াল, ১৩৮৪ হিজরি), ৭. 'আমার স্বপ্নের শহীদ মিনার' (২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬), ৮. 'আমাদের ভাষা' (১৯৫৮ সনের ৩ মে চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণের বর্ধিত ও সংশোধিত অংশ), ৯. 'বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি' (ঈদুল ফিতর, ১৯৭২) ও ১০. 'বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা '(২৭ এপ্রিল, ১৯৭৩)। এর মধ্যে প্রথম আটটি প্রবন্ধ নিয়ে *পাক-বাংলার কালচার* নামে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনে এবং শেষোক্ত দুটি প্রবন্ধ সংযোজন করে ১৯৭৪ সনে নাম পরিবর্তন করে *বাংলাদেশের কালচার* নামে দ্বিতীয় বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

আবুল মনসুর আহমদ, ২০০১, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত, রচনাবলী ৩য় খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, ১৯৮৭, *বাংলাদেশের রাজনীতি: প্রকৃতি ও প্রবণতা, ২১ দফা থেকে ৫ দফা*। ঢাকা ; সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র।

আবদুল হক, ১৯৭৬, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব*। ঢাকা : মুক্তধারা।

আবু তালিব, ১৯৭৯, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা; সাধুতা বনাম অসাধুতা*। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

আব্দুল হাকিম, ১৯৮৯, *নূরনামা*, আবদুল হাকিম রচনাবলী, রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত। ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আহমদ শরীফ, ১৯৭৮, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*। ঢাকা : বর্ণমিছিল।

এম.এ. রহিম, ২০০৫, *বাংলার মুসলামানদের ইতিহাস* (১৭৫৭-১৯৪৭)। ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস।

ওয়াকিল আহমদ, ১৯৮৩, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

কাজী মোতাহার হোসেন, ১৯৯১, রাষ্ট্র-ভাষা ও বাংলাদেশের ভাষা-সমস্যা, *একুশের স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা : বা/এ।

গোলাম মুরশিদ, ১৯৮৮, *রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্র চর্চা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

নুরুল হক ভুঁইয়া (ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক), ১৯৭১, ভাষা আন্দোলনের গোড়ার কথা। উদ্ধৃত: হাসান জামান (সম্পাদিত), ১৯৭১, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। ঢাকা:সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০১, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১৯০১–১৯৩০), ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

নূরুর রহমান খান-১, ১৯৯০, *মুজতবা সাহিত্যের রূপবৈচিত্র্য ও রচনাশৈলী*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

নূরুর রহমান খান-২, ১৯৯০, *সৈয়দ মুজতবা আলী জীবনকথা*। ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, ১৯৭১, ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস। উদ্ধৃত: হাসান জামান (সম্পাদিত), ১৯৭১, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। ঢাকা : সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ।

বিনয় ঘোষ, ২০০৬, *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*। কলকাতা : প্রকাশ ভবন।

মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৯৪, মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী, ৩য় খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৬৮, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য*। ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশান্‌স।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ২০০১, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* (১৯০১–১৯৩০), ১ম খণ্ড। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, ১৯৮০, *বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা-প্রীতি*। ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

রশীদ আল ফারুকী, ১৯৮৭, মুসলিম মানস: সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া। ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

লায়লা জামান, ১৯৮৯, *সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা* (১৯১৮–১৯৫০)। ঢাকা : বা/এ।

সফিউদ্দিন আহমদ, ১৯৯৯, *সাময়িকপত্রে ভাষা-সাহিত্য ও শিক্ষাচিন্তা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী।

সাঈদ-উর-রহমান, ১৯৭৪, আইউব খানের আমলে ভাষা সৃষ্টির চেষ্টা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*।

সৈয়দ মুজতবা আলী, ১৯৭০, পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন।